Vol. 40 | No. 1 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা বানান : তৎসম শব্দ

Volume	40
Issue	1
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জীনাত ইমতিয়াজ আলী
Published online	October 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i1.5
Pages	67-86
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বানান : তৎসম

Check for updates

জীনাত ইমতিয়াজ আলী

তৎসম শব্দ

১.১.০ প্রচলিত অর্থে *তৎসম* শব্দ বলতে বাংলা ভাষার যে-সব সংস্কৃত শব্দ কোনো রকম পরিবর্তন বা রূপান্তর ছাড়াই গৃহীত ও ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলিকে বোঝায়। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ও তৎসম শব্দ সমার্থ নয়। *তৎসম* অর্থ হচ্ছে: সংস্কৃতের 'সম বা সমান' (অশোক মুখোপাধ্যায়: ১৯৮৯:৮৪)। সুকুমার সেনের মতে, (১৯৯৩:৮৭) সংস্কৃত হল 'বৈদিক যুগের অন্তে কথ্য ভাষা হইতে লেখ্য ভাষায় প্রত্যাবর্তন'। তিনি এ পর্যায়ে রচিত 'উপনিষদের ভাষাকে সংস্কৃতের পূর্বরূপ' বলেছেন। তাঁর বিশ্বাস (প্রাগুক্ত), কবি কালিদাস 'উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরচিত এবং অবিকৃত বিভক্তিযুক্ত বৈদিক ভাষা' অর্থেই *সংস্কৃত* পদটি প্রয়োগ করেছেন।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ পুনর্গঠন করতে গিয়ে বাঙালি সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা পাণিনিকে নিদান মেনেছেন। তাঁরই আদর্শে তাঁরা বাংলা সমাস, সন্ধি, প্রত্যয়, বচন, উপসর্গ, পুরুষ এমনকি অক্ষরভিত্তিক ছন্দ-গণনার রীতিপর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সংস্কৃত কারো মুখের ভাষা ছিল না। ভদ্রজনের লিখিত ও পরিচর্চিত একটি কৃত্রিম *ভাষা ছাঁদ-ই সংস্কৃত* ভাষা। আমরা সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করেছি; কিন্তু সেই ভাষার উচ্চারণ গ্রহণ করিনি এবং তা সম্ভবও নয়। সংস্কৃতের পরিবর্তে তৎসম পদটি গ্রহণ করা তাই অধিক নিরাপদ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

বাংলা ভাষাচর্চায় এ কালে যে-পরিমাণে তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে আদিতে তা ছিল না। বাংলার প্রাচীন নিদর্শন 'চর্যাপদের মোট ২০০০ শব্দের মধ্যে প্রকৃত তৎসম শব্দ মাত্র ১০০'। অর্থাৎ, 'শতকরা ৫টি' (পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য; ১৯৮৯: ৩৫২)। পরবর্তীকালের রচনা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে তৎসম শব্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সে-অনুপাত তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, মাত্র ১২:৫। কিন্তু 'উনিশ শতকের পণ্ডিতি প্রভাবের ফলে' সাধু গদ্যে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫২ শতাংশে; আর এ কালের গদ্যে ব্যবহৃত শব্দের শতকরা ৪৪টিই তৎসম (অশোক মুখোপাধ্যায়; ১৯৮৯:৮৪)

ই-কার

১.১.১ তৎসম শব্দের গঠন সংস্কৃত ব্যাকরণ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বানান ভুলের অবকাশ নেই। এ জাতীয় শব্দে ই-কারের ব্যবহার সুনির্দিষ্ট। সাধারণত সংস্কৃত 'ই', 'ইষ্ণু', 'ইঞ্', 'ইৎ', 'ইত' প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দে ই-কার [ি] হয়।

'ই' প্রত্যয় 'অপত্য বা সন্তান-অর্থে' বসে। রাবণের পুত্র হয় রাবণি; সুমিত্রার নন্দন সৌমিত্রি। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে এবং এ জাতীয় কিছু রচনায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষের ঐতিহাসিক ও পৌরণিক নাটক ছাড়া এ কালের কাব্যে, নাটকে এ ধরনের ব্যবহার দুর্লভ।

'ইচ্' (ই) ও 'ইৎ' (ই) প্রত্যয়-সাধিত শব্দে 'চ' ও খণ্ড 'ৎ' বাদ যায় ও 'ই' রক্ষিত থাকে বলে ই-স্থলে ই-কার হয়। যেমন, চুলাচুলি—> চুলোচুলি; কেশাকেশি; সুগন্ধি।

'ইত' প্রত্যয় কৃৎ ও তদ্ধিত দুই-ই। কৃৎ প্রত্যয় 'ইত' [ক্ত] ধাতুর শেষে যুক্ত হয়ে 'ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ-শব্দ' গঠন করে। 'ইত'-এর হ্রস্ব-ই তখন ই-কারে [ি] পরিণত হয়। যেমন, লিখিত; রক্ষিত; পতিত; জারিত; ঘটিত। তদ্ধিত 'ইত' প্রত্যয় সংযোগ, সহযোগ অর্থে বসে। যেমন, বিবাহিত; সীমিত; নিরূপিত; পূরিত।

কৃৎ প্রত্যয় 'ইত্র', 'ইষ্ণু' যোগে তৈরি শব্দে ই-কার হয়। কিন্তু এই ই-কারের পরিচয় ভিন্ন। মূল শব্দের শেষের ব্যঞ্জনেই কেবল-ই-কার হয়। যেমন, চরিত্র; খনিত্র; পবিত্র; বহিত্র; বর্ধিষ্ণু; সহিষ্ণু।

১.১.২ সংস্কৃত 'ইমা', 'ইল', 'ইষ্ঠ' প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠিত শব্দে আশ্রিত ব্যঞ্জনে ই-এর জন্যে ই-কার হয়। সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় 'ইমা'-র মূল 'ইমন'। সংস্কৃত শব্দরূপ অনুসারে বাংলায় শধু পাই 'ইমা'। যেমন, নীলিমা; গরিমা; লঘিমা।

১.১.৩. তদ্ধিত প্রত্যয় 'ইলচ' শব্দের শেষে বসলে 'চ' বাদ যায়। স্বভাবতই তখন তা 'ইল' হয়। শব্দাশ্রিত হওয়ার সময় ই রূপ পায় ই-কারে; আর 'ল' গিয়ে বসে আশ্রিত ব্যঞ্জনের পরে অর্থাৎ, শব্দের শেষে। যেমন, পিচ্ছিল; জটিল; ফেনিল; পঙ্কিল।

১.১.৪. তদ্ধিত প্রত্যয় 'ইষ্ঠ' (ইষ্ঠন্) শব্দে যুক্ত হলে এর হ্রসই ই-কারের রূপ পায়। এ প্রত্যয়ের সাহায্যে 'বহুর মধ্যে তুলনাবাচক' শব্দ গঠিত হয়। যেমন, গরিষ্ঠ; বলিষ্ঠ; কনিষ্ঠ; লঘিষ্ঠ; জ্যেষ্ঠ।

১.১.৫. সংস্কৃত 'ইক' (ষ্ণিক) প্রত্যয়ের সাহায্যে 'সময়, ব্যবসায়, আচরণ' প্রভৃতি বোঝাতে যেসব বিশেষণ পদ গঠিত হয় সেগুলিতে ই-কার হয়। যেমন, ঐচ্ছিক; মৌখিক; সাংবাদিক; সাহিত্যিক; প্রাকৃতিক; ভৌগোলিক; নৈতিক; রাজনৈতিক; পার্বিক; আধুনিক।

১.১.৬. তৎসম শব্দের প্রাতিপদিক রূপ বা সমাস হলে পূর্বের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব অর্থাৎ, ঈ-কারের স্থলে ই-কার হয়। যেমন, মন্ত্রিসভা; প্রাণিবিদ্যা; স্বামিগৃহ; শিল্পিমানস। কিন্তু সমাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম কী পরিমাণ প্রযোজ্য সে-বিষয়ে মতভেদ আছে। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৩৯৩:৪২) লিখেছেন :

> স্বামিসেবা না স্বামীসেবা? পক্ষিতত্ত্ব না পক্ষীতত্ত্ব? মন্ত্রিপর্যায়ে না মন্ত্রীপর্যায়ে? প্রশ্নটি সংক্ষেপে এই—বাংলায় মূলশব্দ, গুণিন্, স্বামিন্, পক্ষিন্, মন্ত্রিন্ না 'গুণী, স্বামী, মন্ত্রী?

তিনি (প্রাগুক্ত) বাংলায় মন্ত্রীপরিষদ; মন্ত্রীসভা; প্রাণীবিদ্যা; মন্ত্রীপুত্র লেখারই পক্ষে।

১.১.৭. 'গণ' যোগে গঠিত শব্দে ঈ-কারের স্থলে ই-কার ব্যবহারের একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অনেকেই 'কর্মিগণ', 'সহকারিগণ', 'মনীষিগণ' লেখেন। কিন্তু এ বানান অসিদ্ধ। এ বিষয়ক সুষ্ঠু মীমাংসা দিয়েছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (নেপাল মজুমদার সম্পা.: ১৯৯২:১০৭) :

> গণ-যোগে শব্দের কোন পরিবর্তন হইবে না, যথা— গুণীগণ, মহাত্মাগণ, রাজাগণ; ভ্রাতাগণ। এইরূপ স্থলে সমাস হয় নাই; কিন্তু সব, সকল প্রভৃতি শব্দের গণ বহুবচনের চিহ্ন। ইহা না মানিলে, 'সুন্দরী বালিকাগণ' ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ হয় না।

১.১.৮ সংস্কৃত 'ঈ' (ইন) প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'ত্ব', 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হলে ঈ-কারের স্থলে ই-কার হয়। যেমন, স্বামিত্ব; উপকারিতা; প্রতিযোগিতা; সহযোগিতা; প্রতিদ্বন্দ্বিতা; বাগ্মিতা।

১.১.৯ মধুসূদনের কাব্যে (*রচনাবলী*: ১৯৯৩:৩৫) আছে: '... কহ হে দেবি অমৃত ভাষিণি ...'। এখানে 'দেবি', 'ভাষিণি' দুটি শব্দেই ই-কার আছে। এ থেকে একটি নিয়ম নির্দেশ করা যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণে সম্বোধন অর্থে বিশেষ্য পদে ই-কার হয়। কিন্তু বাংলায় এ-সব ক্ষেত্রে ঈ-কার হওয়া বিধেয়।

ঈ-কার

১.২.০ তৎসম ই-কারান্ত কিংবা ইন-ভাগান্ত শব্দে আমরা হ্রস্ব-ই উচ্চারণ করি। কিন্তু এমন কিছু তৎসম শব্দ আছে যেগুলি লেখার সময় আমাদের দীর্ঘ ঈ-কার অবশ্যই লিখতে হয়। কারণ সেই একই, সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন। এ বিধান হালকা কিংবা পুনর্বিন্যস্ত না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের তা মানতে হবে। সাধারণত তৎসম 'অনীয়'; 'ইন'; 'ঈ'; 'ঈয়'; 'ঈর'; 'বিন' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ঈ-কার [ী] হয়।

১.২.১ 'অনীয়' প্রত্যয় ক্রিয়ামূলের শেষে বসে বিশেষণ পদ (উচিত বা আবশ্যিকতা অর্থে) গঠন করে। যেমন, গ্রহণীয়; পানীয়; সহনীয়; বরণীয়; রমণীয়; স্মরণীয়।

১.২.২ 'ইন'-এর মূল 'ইনি'। শব্দে যুক্ত হলে 'ইনি'-র ই-কার বাদ যায়। তখন আমরা পাই 'ইন'। যেমন, গুণিন; যৌগিন; ধনিন। এ জাতীয় শব্দকে বলা হয় ইন-ভাগান্ত শব্দ। বাংলায় এ-সব শব্দ এই রূপে, অর্থাৎ ইন-ভাগান্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় না। বাংলায় কেবল ব্যবহৃত হয় 'কর্তৃকারকের একবচনের রূপ' (অশোক মুখোপাধ্যায়; প্রাগুক্ত: ৩৪)। অর্থাৎ, বাংলায় আশ্রিত ব্যঞ্জনে 'ইন' ঈ-কাররূপেই রক্ষিত হয়। যেমন, যোগিন্→ যোগী; →গুণিন্→গুণী; ধনিন্→ ধনী; প্রতিদ্বন্দ্বিন্→প্রতিদ্বন্দ্বী।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনেকটা যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ঈ-কারের ব্যবহার সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে পড়ে। সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতেরা একটি সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েও দ্বিধামুক্ত হতে পারেননি। বাংলা ভাষায় গৃহীত সংস্কৃত 'ইন' প্রত্যয়ান্ত শব্দমাত্রই দীর্ঘ ঈ-কার হবে এমন কথা তাঁরা বলতে পারবেন না। পুংলিঙ্গে প্রথমার এক বচনের যে-রূপ তাঁরা নির্দেশ করেছেন তাও বিতর্ক সাপেক্ষ। লিঙ্গের প্রসঙ্গ তুললে অন্য সমস্যাও আসে। কেননা সংস্কৃত শব্দমাত্রেরই লিঙ্গ আছে এবং লিঙ্গভেদে শব্দের বানান বৈচিত্র্যধর্মী। সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক ই-কারান্ত শব্দে দীর্ঘ-ঈ বা দীর্ঘ ঈ-কার হয় না, ই-কার হয়। আমরা দীর্ঘঈ-কার দিয়ে লিখি এমন অনেক সংস্কৃত শব্দের বানান সে-ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী ভুল। এ-প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (প্রাগুক্ত: ৪৪):

> ইন্-ভাগান্ত শব্দ সর্বত্র দীর্ঘ-ঈকারান্ত হলে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারেই 'স্থায়ী কীর্তি, স্থায়ী আসন' অসুদ্ধ হবে, কারণ 'স্থায়ী' পুংলিঙ্গ, 'ব্যক্তি' স্ত্রীলিঙ্গ, 'আসন' ক্লীবলিঙ্গ। 'গুণী ব্যক্তি' ভুল, 'গুণী' পুংলিঙ্গ, 'ব্যক্তি' স্ত্রীলিঙ্গ; 'গুণী লোকেরা, গুণী লোকের, গুণী লোককে' ভুল, কারণ 'লোকেরা বহুবচন, 'লোকের' ষষ্ঠী, 'লোককে' দ্বিতীয়া বিভক্তি। অর্থাৎ দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত 'স্থায়ী, 'গুণী' অল্পক্ষেত্রেই সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্মত হয়।

মণীন্দ্রকুমার সংস্কৃত ইন-ভাগান্ত শব্দে ই-কার ব্যবহারেরই পক্ষে। আমরা এ যুক্তি মানি। 'সংস্কৃত 'ইন' প্রত্যয়কে বাংলায় ই প্রত্যয়'-রূপে গ্রহণ করা সংগত এবং তাতে 'বানানের সরলতা ও সঙ্গতি' দুই-ই রক্ষিত হবে।

১.২.৩ 'ঈ' একান্তই স্ত্রী প্রত্যয়। পুরুষবাচক শব্দের শেষে এ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। 'ঈ'-কে আমরা তখন কারে [ী] পরিণত করে লিখি। যেমন, কুমারী; মানবী; দাসী; ষোড়শী; গোপী; চণ্ডী; ছাত্রী; ঘোটকী; চাতকী; দেবী; ময়ূরী; মানবী; রজকী; সখী; সতী; সিংহী; সুন্দরী।

শব্দের শেষে যুক্ত হওয়া ছাড়াও স্ত্রী-প্রত্যয় 'ঈ' অন্য প্রত্যয় অর্থাৎ, 'ইন', 'বিন', 'তৃ', 'তা', 'অৎ', 'বৎ', 'মৎ', 'ইয়স' প্রত্যয়ের অন্তে বসে স্ত্রীবাচক শব্দ তৈরি করে। এ সব শব্দের শেষে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। যেমন, **ইন + ঈ = ইনী**: বিদেশিনী; দুঃখিনী; পাগলিনী; রজকিনী; বাঘিনী; **বিন + ঈ = বিনী**: মায়াবিনী; মেধাবিনী; গরবিনী; **তৃ + ঈ = ত্রী**: কর্ত্রী; দাত্রী; নেত্রী; **অৎ + ঈ = অতী**: সতী; মহতী; **বৎ + ঈ = বতী**: ধনবতী; গুণবতী;রূপবতী; **মৎ + ঈ = মতী**: শ্রীমতী; আয়ুষ্মতী; **ইয়স + ঈ = ইয়সী**: গরিয়সী; প্রেয়সী; শ্রেয়সী।

এমন কিছু তৎসম শব্দ আছে যেগুলি স্ত্রীবাচক এবং উচ্চারণের দিক থেকে ই-ধ্বনি-অন্ত; কিন্তু লেখার সময় আমরা এগুলির শেষে ঈ-কার ব্যবহার করি। ব্যাকরণবিদরা বলেন, বিশেষ নিয়মে (আর্ষ-প্রয়োগে) এ সব শব্দ স্ত্রীবাচক হয়েছে। যেমন, যুবতী; বান্ধবী।

১.২.৪ 'ঈর' প্রত্যয়ের মূল 'ঈরচ্'। ধাতুর পরে বসলে শেষের 'চ' বাদ যায়। তখন 'ঈর' থাকে। বাংলায় এই সংস্কৃত প্রত্যয়টি 'ঈর্'-রূপেই ব্যবহৃত হয়। মূলের ঈ-এর জন্যে 'ঈর' প্রত্যয় সাধিত শব্দে ঈ-কার মান্য। যেমন, গভীর; শরীর।

১.২.৫ 'ঈন' ও 'ঈয়' প্রত্যয়ের ব্যবহার বিচিত্র। যেসব তৎসম শব্দে ঈ-কার অনিবার্য বলে মনে করা হয়; সেগুলির মধ্যে 'ঈন' ও 'ঈয়'-প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ বিশেষভাবে বিবেচ্য। এ জাতীয় শব্দের মূল প্রত্যয়েই শুধু ঈ নেই; এদের উচ্চারণও দীর্ঘ হয়। বিশেষ্য এবং বিশেষণ দুই অর্থেই 'ঈন' বসে। যেমন, অভ্যন্তরীণ; কুলীন; গ্রামীণ; প্রাচীন; নবীন; বিশ্বজনীন/বৈশ্বজনীন; শালীন; সর্বজনীন; সম্মুখীন।

'ঈয়' প্রত্যয় বিশেষ্য পদের পরে বসে বিশেষণ পদ গঠন করে। উৎপন্ন বা জাত, 'তদবিষয়ক অর্থে' ঈয় প্রত্যয় বসে। যেমন, দেশীয়; জাতীয়; স্বীয়; আত্মীয়; পরকীয়; স্বর্গীয়; বঙ্গীয়; শারদীয়; রাষ্ট্রীয়; বর্গীয়; স্বকীয়; কাকতালীয়; রাজকীয়; ধর্মীয়; মাননীয়; দানবীয়; বর্ষীয়; দলীয়; স্থানীয়; নাটকীয়।

১.২.৬ সংস্কৃত 'বিনি' প্রত্যয় শব্দের পরে বসলে শেষের 'ই' বাদ যায়। তখন থাকে 'বিন'। যেমন, মেধা + বিন = মেধাবিন; মায়া + বিন = মায়াবিন। কিন্তু বাংলায় এ জাতীয় ব্যবহারের অবকাশ নেই। বাংলা ভাষায় এ-সব শব্দের 'প্রথমার একবচনের রূপ' ব্যবহৃত হয়। 'বিন' স্থলে তাই আমরা লিখি 'বী'। যেমন, মেধাবী; মায়াবী। তৎসম 'ইন' প্রত্যয়ের মতো 'বিন' প্রত্যয়যোগে গঠিত যে-সব শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে; সেগুলি সম্পর্কে ভাবার প্রয়োজন আছে। 'তেজস্বী', 'যশস্বী' লিখতেও আমরা শেষে দীর্ঘ ঈ-কার [ী] দেই। কারণ, সেই 'বিন' প্রত্যয়ের ব্যবহার: তেজস্ + বিন; যশস্ + বিন। লক্ষণীয, 'মায়াবী', 'মেধাবী' শব্দে 'বী' স্পষ্টতই এবং বেশ জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। 'তেজস্বী', 'যশস্বী' শব্দে 'ব'-এর উচ্চারণ নেই। এ সব শব্দে 'ব' (অন্তঃস্থ) আছে চুপি সারে, দন্ত্য স-এর নিচে অনুচ্চারিত যুক্তব্যঞ্জনরূপে।

১.২.৭ প্রত্যয়-সাধিত শব্দের মতো সন্ধিবদ্ধ শব্দে ঈ বা দীর্ঘ ঈ-এর জন্যে দীর্ঘ ঈ-কার ব্যবহারের বিধান সংস্কৃত ব্যাকরণে আছে। স্বরসন্ধি ও বিসর্গ সন্ধিযোগে গঠিত কিছু নির্বাচিত শব্দে এ নিয়ম প্রযোজ্য। স্বরসন্ধিতে ই + ই = ঈ (যেমন : অতীত; অভীষ্ট; রবীন্দ্র; গিরীন্দ্র); ই + ঈ = ঈ (যেমন, প্রতীক্ষা; অধীশ্বর); ঈ + ই = ঈ (যেমন, শচীন্দ্র; মহীন্দ্র) এবং ঈ + ঈ = ঈ (যেমন, সতীশ; রজনীশ) হয়।

১.২.৮ বিসর্গ সন্ধিতে দীর্ঘ ঈ ব্যবহারের নিয়ম স্বরসন্ধির তুলনায় সংকুচিত। এখানে বিসর্গের পর কেবল 'র' থাকলে পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় অর্থাৎ হ্রস্ব-ই দীর্ঘ ঈ বা দীর্ঘ ঈ-কার হয় এবং বিসর্গ লোপ পায় (বিসর্গের জন্যে নির্ধারিত 'র' বাদ যায়। যেমন, নীরব; নীরক্ত; নীরন্ধ্র; নীরোগ; নীরস।

১.২.৯ তৎসম শব্দ 'বীত' (= বি + $\sqrt{\text{ই}}$ + ত) পদ হিসেবে বিশেষণ। অর্থ: 'অতীত, বিগত, নিবৃত।' শ্রদ্ধার ভাব কম হলে আমরা বলি 'বীতশ্রদ্ধ; আকর্ষণের অভাব বোঝাতে ব্যবহার করি 'বীতআকর্ষণ'। এভাবেই পূর্বপদে 'বীত' থেকে যেসব সমাসবদ্ধ পদ বা যৌগিক শব্দ হয় সেগুলিতে দীর্ঘ ঈ [বী] হয়। এ জাতীয় কিছু শব্দ হচ্ছে: বীতনিদ্রা; বীতভয়; বীতবীর্য।

১.২.১০ অন্তরিক্ষ/অন্তরীক্ষ, উদগিরণ/উদ্‌গীরণ; নৌকা অর্থে তরি/তরী; শ্রেণি/শ্রেণী—শব্দগুলির দুটি বানানই অভিধানসম্মত। ব্যবহার বৈগুণ্যে 'তরি' কিংবা 'শ্রেণি' বিদায় গ্রহণ করেছে। 'অন্তরিক্ষ'-এর তুলনায় 'অন্তরীক্ষ' অধিক প্রচলিত। যে-সব শব্দের বানান হ্রস্ব ই-কার ও দীর্ঘ ঈ-কার দুইই সিদ্ধ—সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কার ব্যবহার করাই উচিত। যেমন, অঙ্গুরি; অঙ্গুলি; অটবি; অবনি; অরণি; অলি; আকুতি; আবির; কলসি; কুটির; কুহেলি; কোটি; গণ্ডি; চিৎকার; তরণি; পেশি; বিপণি; ভঙ্গি; মঞ্জুরি; মসি; মহামারি; শাল্মলি; সরণি; সূচি; স্বাতি। এ উদ্দেশ্যে তৎসম শব্দের একটি ব্যবহারিক অভিধান প্রণীত হলে ভালো হয়।

১.২.১১ ক ঈ-কার দিয়ে 'কীংবদন্তি' বানান এখনো প্রচলিত। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (১৯৯২:১১৫)-এ 'কিংবদন্তী' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু শব্দটির শুরুতে ও শেষে কোথাও দীর্ঘ-কার সিদ্ধ নয়। কিম্ + অন্তি = কিংবদন্তি। দুক্ষেত্রেই ই-কার।

ই-কার, ঈ-কার : দুই বানান দুই অর্থ

১.৩.১ **টিকা, টিকা** : দুটিই তৎসম শব্দ কিন্তু এদের অর্থ ভিন্ন। 'টিকা' অর্থ: 'মৃত্তিকাচন্দনাদিরচিত গোল চিহ্ন', 'রাজ্যাভিষেকে রাজার কপালে তিলক' (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: ১৯৬৬:৯৮০), গোলচিহ্ন। রাজটিকা, জয়টিকা, মঙ্গলটিকা—এ জাতীয় সমাসবদ্ধ পদের 'টিকাতেও ই-কার [টি]। বসন্তের টিকা, জ্বরের টিকা কিংবা এ কালের বি ভাইরাসের 'টিকা' লিখতেও সেই একই বানান ট হ্রস্ব-ই দিয়ে 'টিকা'।

'টীকা' অর্থ 'দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা-পুস্তক।' ব্যাখ্যান, আলোচনা, বিশ্লেষণ, বীক্ষণ 'টীকাকার', 'টীকাভাষ্য' লিখতে গিয়ে হ্রস্ব-ই দিয়ে 'টিকা' লেখা অসিদ্ধ ও অবিধেয়।

১.৩.২ **'কৃতি', 'কৃতী'** শব্দের বানান বিভ্রাট ঘটা স্বাভাবিক। 'কৃতি' (কৃ+তি) বিশেষ্য পদ; অর্থ: 'কর্ম'; 'নির্মাণ'। আমরা বলি, কারুকৃতি; কবিকৃতি; উপন্যাসকৃতি। ভালো কাজ বোঝাতে 'সুকৃতি' শব্দও বহুল ব্যবহৃত।

'কৃতী' (কৃত+ইন) অর্থ 'কৃতকার্য, মহৎ চেষ্টায় সফল হইয়াছে এমন'। এই 'কৃতী' দিয়েই লেখা হয় 'কৃতী সন্তান'; 'কৃতী পুরুষ'; 'কৃতী ঔপন্যাসিক'। ইন-ভাগান্ত শব্দে ই-কার ব্যবহার করা হলে এ জাতীয় শব্দের অর্থান্তর ঘটবে বলে

অনেকে মনে করেন। কিন্তু অভিন্ন উচ্চারণের অনেক শব্দই ব্যবহার অনুষঙ্গে ভিন্নার্থক হয়ে ওঠে।

উ ও উ-কার এবং ঊ ও ঊ-কার

১.৪.০ বাংলা বর্ণমালায় 'উ' ও 'ঊ' দুইই বর্তমান। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে ও 'বাংলারূপে উ' (নেপাল মজুমদার সম্পা.; ১৯৯২:৮৩-৮৪) রয়েছে। দীর্ঘ ঊ বা ঊ-কার আমরা কেবল সংস্কৃত শব্দে ব্যবহার করি এবং তাও কিছু নির্বাচিত শব্দে। অর্থাৎ, 'ঊ' বা 'ঊ'-কার ব্যবহারের এলাকাটি সংকুচিত। সে-তুলনায় হ্রস্ব উ বা উ-কার প্রয়োগ-দিগন্ত ব্যাপ্ত ও প্রসারিত। সংক্ষিপ্ত পরিধটির উল্লেখ করলেই তাই অবশিষ্ট পরিবৃত্তের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সহজ হবে। আমরা তখন বুঝব, এ ভূগোলের বাইরের পৃথিবী অর্থাৎ, উ-ধ্বনিযুক্ত অন্যান্য শব্দে উ বা উ-কার হবে।

১.৪.১ তৎসম শব্দে তিনটি ক্ষেত্রে ঊ বা ঊ-কার ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, এমন কিছু তৎসম শব্দ আছে যেগুলির আদিতেই ঊ রয়েছে। যেমন, ঊরু; ঊর্ণ; ঊর্ধ্ব; ঊর্মি; ঊষর; ঊষা; ঊষ্ণ; ঊষ্ম; ঊহ্য।

দ্বিতীয় প্রকার শব্দে ঊ-র ব্যবহার সংক্ষিপ্তরূপে অর্থাৎ, ঊ-কার হিসেবে। এ জাতীয় শব্দগুলি হচ্ছে: উলূ; কূট; কূটজ; কূপ; কূর্চিক; কূর্ম; দূত; গূঢ়; ঘূর্ণ; ঘূর্ণি; চূড়া; চূত; চূর্ণ; চূষী; তূর্য; তূর্ণ; দূত; দূর; দূর্বা; দূষণ; ধূম; ধূলি; ধূসর; পূজা; পূত; পূতি; পূর্ব; পূরক; পূরণ; পূর্ণ; ভূ; ভূত; ভূমি; ভূয়; ভূজ; ভূষণ্ডি; ভূষণ; মূক; মূঢ়; মূত্র; মূর্খ; মূর্ত; মূর্তি; মূর্ধা; মূল; মূষিক; যূথ; যূপ; শূক; শূকর; শূন্য; শূর; শূর্প; শূল; সূক্ত; সূক্ষ্ম; সূচ; সূত; সূত্র; সূর; সূরী; সূর্য; স্ফূর্ত; স্ফূরণ; হূত; হূন।

তৃতীয়ত, সন্ধিবদ্ধ কিছু শব্দে দীর্ঘ ঊ বা ঊ-কার সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। যেমন,

[ক] উ + উ = ঊ। উদাহরণ: কটু + উক্তি = কটূক্তি; মরু + উদ্যান = মরূদ্যান।

[খ] উ/ঊ + ঊ = ঊ। উদাহরণ : লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি; বধূ + উৎসব বধূৎসব।

[গ] ই + ঊ = ঊ। উদাহরণ : নি + ঊন = ন্যূন।

১.৪.২ তৎসম 'ঊন' উপসর্গের মূলে 'ঊ' থাকায় এ উপসর্গের সাহায্যে গঠিত শব্দমাত্রেই ঊ হয়। এ শ্রেণীর শব্দগুচ্ছ হচ্ছে: ঊনআশী; ঊনকোটি; ঊনচল্লিশ;

ঊনত্রিশ; ঊননব্বই; ঊনপঞ্চাশ; ঊনপাঁজুরে; ঊনবিংশ; ঊনবিংশতি; ঊনষাট; ঊনসত্তর।

১.৪.৩ তৎসম **অন্তর্ভুক্ত** (অন্তর্ভূক্ত) ও **উষা** (ঊষা) শব্দদ্বয়ে উ-কার ও ঊ-কার দুইই সিদ্ধ। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (১৯৯০:২৭)-এ দুটি বানানই (অন্তর্ভুক্ত/অন্তর্ভূক্ত) গৃহীত হয়েছে। লেখকদের মধ্যেও স্বাধীনতা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের (*রচনাবলী*-২, ১৩৯৩:৬২৮) অন্বিষ্ট উ-কার (*আজ আমরা সমাজের সমস্ত কতব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজ-**বহির্ভুত** স্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি*)। বুদ্ধদেব বসু (১৯৮০:১৭) ঊ-কার দিয়ে 'অন্তর্ভূক্ত' লিখেছেন (*আধুনিক কালের সব কবিকেই দ্বিতীয় দলের **অন্তর্ভূক্ত** করা যায়; যাঁরা নামত 'ক্লাসিসিস্ট'...*।)। শব্দটির ব্যুৎপত্তি সন্ধান করলে আমরা পাই: অন্তর+ভুক্ত (ভুজ+ক্ত) = অন্তর্ভুক্ত। "অতএব অন্তর্ভুক্ত শব্দটি অসিদ্ধ নয়, অন্তত বাংলায় নয়" (সুভাষ ভট্টাচার্য: ১৯৮৬:১৬)। অন্তর্ভুক্ত-এর বিপরীতার্থক শব্দ 'বহির্ভুক্ত'-ও শুদ্ধ।

'উষা'-র তুলনায় 'ঊষা'-র ব্যবহার অধিক, বলা যায় সুপ্রচুর। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে 'উষা' আছে। *অমরকোষ* গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে ঊষা (প্রাগুক্ত):৭২)। রবীন্দ্রনাথ (*রচনাবলী*-৮: ১৩৯৫:৩২৬-২৭) এ বানানই গ্রহণ করেছে :

১. *আদেশ করো আজ **উষার** প্রথম আলোকে প্রথম তোমাকে দেখব।*

২. *ওই শোনো, **উষার** প্রথম কোকিলের ডাক, ...।*

সুতরাং, 'অন্তর্ভুক্ত'-এর মতো 'উষা' লিখতে দীর্ঘ ঊ-কারের দাসত্বের প্রয়োজন নেই।

মূর্ধন্য ণ ও দন্ত্য ন-এর ব্যবহার

১.৫.০ দীর্ঘ ঈ-এর মতো মূর্ধন্য ণ-এর কোনো স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই। বাংলায় মূর্ধন্য ণ-মাত্রই দন্ত্য ন উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাংলা ট-বর্গীয় ব্যঞ্জনের এই পঞ্চম বর্ণটিকে এখনো আমরা পরিহার করতে পারিনি। দীর্ঘ ঈ-কার মতোই আমরা তাকে সযত্নে ও সনিষ্ঠায় রক্ষা করে চলেছি। বাংলা ভাষার একটি একান্ত নিজস্ব ব্যাকরণ লেখা না-হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে বহিরারোপিত এবং বাংলা ভাষার আভ্যন্তর সংগঠনবৈরী ও আমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই আনাত্মীয়ের জন্যে স্থান সুনির্দিষ্ট করে রাখতেই হবে। সংস্কৃত মূর্ধন্য ণ এবং বাংলায় উচ্চারিত মূর্ধন্য 'ণ'-এর

মধ্যেকার পার্থক্য সুস্পষ্ট। সংস্কৃত মূর্ধন্য ণ 'তাড়িত, নাসিক্য, ঘোষ ও অল্প প্রাণ।' কিন্তু বাংলা উচ্চারণে তা 'দন্তমূলীয় নাসিক্য ও স্পর্শ' ধ্বনি।

১.৫.১ তৎসম শব্দে মূর্ধন্য ণ-এর ব্যবহার ণত্ব-বিধির (দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ-তে পরিণত হওয়ার নিয়ম) দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। তৎসম শব্দে ঋ, র-এর পর মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন, ঋণ; রণ; ত্রাণ; ভূষণ; কৃষ্ণ; অরণ্য; অর্ণব; ত্রাণ; কর্ণ।

১.৫.২ ট-বর্গীয় (ট, ঠ, ড) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের নাসিক্য ধ্বনি সব সময় মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন, কণ্টক; কণ্ঠ; বণ্টন; কাণ্ড; ঘণ্ট; গুণ্ঠন; কুণ্ঠা; খণ্ড; দণ্ড; কুণ্ড; কুণ্ডলী; চণ্ড; ঠাণ্ডা; গণ্ডার; গণ্ডুষ; দণ্ড; মণ্ডল; পাণ্ডা; পণ্ডিত; বিতণ্ডা; ভণ্ড; শিখণ্ডি।

১.৫.৩ একই পদের মধ্যে ঋ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গীয় (ক, খ, গ, ঘ) বর্ণ, প-বর্গীয় (প, ফ, ব, ভ) বর্ণ, য, ব, হ এবং অনুস্বার [ং] থাকলে মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন, কৃপণ; দর্পণ; নির্মাণ; বৃংহণ; ম্রিয়মাণ।

১.৫.৪ 'প্র', 'পরা', 'পরি', 'নির্', উপসর্গের পর, নম্, নশ্, নুদ্, অন্, হন্ ধাতুর দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন, প্রণতি; প্রণিধান; প্রণিপাত; পরায়ণ; উত্তরায়ণ; পরিবহণ।

১.৫.৫ কতগুলি সমাসবদ্ধ শব্দে মূর্ধন্য ণ ব্যবহারই ব্যাকরণ সম্মত। যেমন, অগ্রণী; পূর্বাহ্ণ; অপরাহ্ণ।

১.৫.৬ এমন কিছু তৎসম শব্দ আছে যেগুলিতে সব সময়ই মূর্ধন্য ণ হয়। এগুলিকে বলে নিত্য মূর্ধন্য ণ-বাচক শব্দ। যেমন, অণু; কঙ্কণ; কণা; কল্যাণ; গণ; গণ্য; গৌণ; ঘুণ; তূণ; নিক্বণ; নিপুণ; কোণ; পণ্য; পুণ্য; ফণা; বণিক; বাণ; বাণিজ্য; গুণ; লাবণ্য; বীণা; বেণী; বেণু; শণ; শোণিত; স্থাণু।

১.৫.৭ তৎসম শব্দের বানানে বেশ কিছু ক্ষেত্রে মূর্ধন্য ণ ব্যবহার নিষেধ আছে। এ সব শব্দে সব সময় দন্ত্য ন হয়। যেমন,

[ক] ত-বর্গীয় (ত, থ, দ, ধ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের নাসিক্য বর্ণ কেবলই দন্ত্য ন হয়। যথা, দন্ত; পান্থ; দ্বন্দ্ব; বন্ধু; কান্ত; চিন্তিত; জন্তু; ক্রান্ত; অনন্ত; উড়ন্ত; পন্থ; গ্রন্থ; মন্থন; চন্দ্র; কন্দর; খন্দ; ছন্দ; তন্দ্রা; নন্দন; বৃন্দ; মন্দ্র; সন্ধি; সুন্দর; স্পন্দন।

[খ] ঋ, র, ষ-এর পর অন্য কোন বর্গীয় ব্যঞ্জন থাকলে দন্ত্য ন-ই সিদ্ধ। যেমন, দর্শন; অর্চনা; প্রার্থনা; আবর্তন; কর্তন; মার্জনা।

[গ] 'অহ্ন' যোগে গঠিত শব্দে দন্ত্য ন হয়। যেমন, আহ্নিক; মধ্যাহ্ন; সায়াহ্ন।

[ঘ] কিছু তৎসম শব্দের সমাস হলেও পরপদের দন্ত্য ন-এর পরিবর্তন হয় না। যেমন, সর্বনাম; দুর্নীতি; বরানুগমন।

১.৫.৮ কিছু পদের শেষে মূর্ধন্য ণ হয় না, অর্থাৎ, দন্ত ন হয়। যেমন, শ্রীমান; ব্রহ্মন্।

১.৫.৯ কিছু তৎসম শব্দের বানানে সন্ধির দ্বারা দন্ত্য ন ব্যবহার নির্ধারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি সন্ধিসূত্র মনে রাখা প্রয়োজন। ব্যঞ্জন সন্ধিতে "যদি ন কিংবা ম পরে থাকে, তবে পদের অন্তস্থিত বর্গীয় প্রথম ব্যঞ্জনস্থানে পঞ্চম অথবা তৃতীয় বর্ণ হয় ... এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণস্থানে শুধু পঞ্চমবর্ণ হয়।" যেমন, জগৎ + নাথ = জগন্নাথ; কাঁধ্ + না = কান্না।

১.৫.১০ তৎসম কৃৎ প্রত্যয় 'নক্' এবং 'নঙ' যুক্ত পদে দন্ত্য ন-এর ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত। 'নক্ যোগে গঠিত শব্দে শেষের 'ক্' ধ্বনিটি রক্ষিত হয় না। সেক্ষেত্রে আমরা কেবল দন্ত্য ন-কেই সাধিত শব্দে পাই। যেমন, মী+নক্ = মীন, স্ফায়্ + নক্ = ফেন। 'নঙ'-এর বেলায়ও একই বিধি। গঠিতশব্দে 'ঙ' বাদ যায় এবং দন্ত্য ন বর্তমান থাকে। যেমন, যজ্ + নঙ্ = যজ্ঞ; প্রচ্ছ্ + নঙ্ = প্রশ্ন।

১.৫.১১ মূর্ধন্য ণ দিয়ে 'মৃন্ময়' অনেকেই লিখে থাকেন। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন (ও অন্যান্য)-এর উক্তি (১৩৫৩:৮০-৮১) :

> প্রধান প্রধান অনেক লেখকই এই শব্দে মূর্ধন্য ণ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভুল।

তিনি 'কাতন্ত্র ব্যাকরণের পরিশিষ্টকারের উক্তি' (মৃন্ময়মত্র ন ণত্বং পদান্তত্বাৎ) উদ্ধৃতি করে দেখিয়েছেন যে, 'পদের ন, ঋ-এর পরে হইলেও পদের অন্তঃস্থিত বলিয়া ণ হইল না'। অর্থাৎ, 'মৃন্ময়' লিখতে দন্ত্য ন-ই সিদ্ধ।

১.৫.১২ 'রোমাঞ্চ' বা 'কম্পন' অর্থে অনেকেই মূর্ধন্য ণ দিয়ে 'শিহরণ' লেখেন। সংস্কৃত ণত্ববিধির দ্বারাই তাঁরা পরিচালিত হন। কিন্তু 'শিহরন' তৎসম শব্দ নয়। তাই এখানে র-এর পর দন্ত্য-ন হবে ('শিহরন')।

১.৫.১৩ তৎসম 'রাণী' শব্দটি লিখতে গিয়ে আমরা স্বাধীনতা ভোগ করি। র-এর পর নাসিক্য ব্যঞ্জন আছে বলেই লিখি 'রাণী'। রাজা-রানীদের অস্তিত্ব এ কালে থাকলেও তাঁরা ক্ষমতাহার, আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অতীতেও তাঁরা সাধারণ থেকে দূরে ছিলেন। মূর্ধন্য-ণ দিয়ে 'রাণী' লেখা হয় বোধ করি তাঁকে আরো বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ করার মতলবে। সংস্কৃত ব্যাকরণ বলে, 'রাণী' কেবল বিকল্পেই সিদ্ধ। কী দরকার প্রথমকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয়ের অনুসরণ। রবীন্দ্রনাথ (১৯৯৫:৪০) সর্বত্র 'রানী' লিখেছেন এবং তাতে রানীর মর্যাদার কোনো হানি হয়নি।

শ, ষ, স-এর ব্যবহার

১.৬.০ শ, ষ, স-তিনটিই শিসধ্বনি। উচ্চারণের সময় শিস দেয়ার মতো আওয়াজ হয় বলেই এগুলির এই নামকরণ। ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারে শ 'উষ্ম (সংকীর্ণ) ও তালব্য। কিন্তু এর উচ্চারণ সব সময় একই ধারা মেনে চলে না। আমরা যেভাবে 'শসা' কিংবা 'আশি' (সংখ্যাবিশেষ) উচ্চারণ করি সে-অনুযায়ী 'শ্রাবণ' শব্দ উচ্চারণ করি না। অর্থাৎ, তালব্য শ-এর উচ্চারণ কখনো-কখনো দন্ত্যমূলীয় স-এর অনুরূপ হয়।

১.৬.১ মূর্ধন্য ষ-এর উচ্চারণ তালব্য শ-এর মতো। সংস্কৃতের এই ধ্বনি প্রতীকটি আমাদের বর্ণমালায় আছে; কিন্তু উচ্চারণে নেই। তবে খুব সচেতন হয়ে উচ্চারণ করলে কিছু তৎসম বিশেষত, ট-বর্গীয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনে (যেমন, অষ্ট; প্রতিষ্ঠা) মূর্ধন্য ষ-এর মূল উচ্চারণ রক্ষা করা যায়।

১.৬.২ দন্ত্য স উষ্ম হলেও বাংলায় প্রায়ই তালব্য শ-এর মতো উচ্চারিত হয়। আমরা লিখি 'সকাল', 'সন্ধ্যা'; কিন্তু উচ্চারণ করি 'শকাল', 'শোন্ধা'। যুক্ত ব্যঞ্জনে অবশ্য দন্ত্য স-এর মূল উচ্চারণ অবিকৃত থাকে।

১.৬.৩ বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী দন্ত্য স-এর ব্যবহার সর্বাধিক। ফলে অপর দুটি শিস ধ্বনি 'শ' ও 'ষ' বাংলা ভাষা থেকে পরিহার করার চিন্তা বিভিন্ন সময় ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষা-চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে। সুধীর মিত্র শুধু দন্ত্য-স ব্যবহারের পক্ষে মত (নেপাল মজুমদার সম্পা.: প্রাগুক্ত: ৪৯-৫০) দিয়েছেন সেই ১৩৪০ (১৯৩৩) সালে :

শ, ষ ও স—এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণও বাংলায় এক রকম। ত-বর্গ এবং শুদ্ধ ঋ বা র সংযুক্ত হইলে ইহাদের উচ্চারণ ইংরাজী s অক্ষরের ন্যায়, অন্যত্র sh-র ন্যায় হইয়া থাকে। শ ও ষ অপেক্ষা স-এর প্রয়োগ বাংলায় অধিক এজন্য আমরা স-কে রাখিবার পক্ষপাতী।

আমাদের ভাষাভাবুকেরাও (*শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী*-৩; ১৯৯৫:৪৮৬) এক সময় এ জাতীয় চিন্তায় তাড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই অভিমত, সংস্কার কিংবা পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর হয়নি। তৎসম শব্দে 'শ', 'ষ' ও 'স' পূর্বের মতোই স্থান দখল করে আছে।

১.৬.৪ তৎসম শব্দে তালব্য শ ব্যবহৃত হয় দুটি ধারাক্রম অনুসারে;

[এক] শব্দের মূলানুগত্য রক্ষার জন্যে:

[দুই] সন্ধিসূত্রের দ্বারা বানান সুনির্দিষ্ট হয়ে।

যেসব তৎসম শব্দের মূলে তালব্য শ আছে সেগুলিতে শ হবে। এ জাতীয় শব্দের পরিচয় তিন রকম:

(ক) কিছু শব্দ আছে যেগুলির শুরুতেই তালব্য শ আছে। যেমন, শকট; শক্ত; শঙ্কা; শঙ্খ; শক্র; শব।

(খ) কিছু শব্দের উপান্তে তালব্য শ বসে। যেমন, দর্শন; শশী; শাখা।

(গ) কিছু শব্দের শেষে তালব্য শ হয়। যেমন, নাশ; স্পর্শ; দশ।

১.৬.৫ সন্ধির একটি ক্ষেত্রে তলব্য শ-এর বিধান আছে। চ্ বা ছ্ পরে থাকলে বিসর্গের স্থলে শ হয়। যেমন, নিশ্চয়; দুশ্চরিত্র; নিশ্চেষ্ট; নিশ্ছিদ্র; নিশ্চল; দুশ্চিন্তা; নিশ্চিন্ত; মনশ্চক্ষু; শিরশ্ছেদ।

১.৬.৭ নিপাতনে সিদ্ধ কিছু সন্ধিতে শ হয়। যেমন, আশ্চর্য; হরিশ্চন্দ্র।

১.৭.১ তৎসম শব্দে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার ষত্ববিধি (দন্ত্য-স মূর্ধন্য ষ-তে পরিণত হওয়ার নিয়ম) দ্বারা নির্ধারিত। এক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় নিয়মগুলি সুপরিচিত :

[ক] অ, আ ছাড়া স্বরবর্ণ এবং ক ও র-এর 'পরস্থিত প্রত্যয়াদির দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়।' যেমন, ভবিষ্যৎ; মুমূর্ষু; গোষ্পদ।

[খ] ট-বর্গীয় ('ট', 'ঠ') সংযুক্ত বর্ণের শিসধ্বনি সব সময় মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন, অষ্ট; কষ্ট; কাষ্ঠ; ওষ্ঠ; বৃষ্টি; দৃষ্টি; স্পষ্ট; পিষ্ট; পুষ্ট; শিষ্ট; ক্লিষ্ট; প্রবিষ্ট; অনিষ্ট; নিষ্ঠা; প্রতিষ্ঠা; গোষ্ঠ; তিষ্ঠ; কৃষ্টি; পৃষ্ঠ; ঘৃষ্ট; বৃষ্টি; মিষ্ট; দৃষ্ট; শ্রেষ্ঠ; দষ্ট; নষ্ট; ভ্রষ্ট; কোষ্ঠ; জ্যেষ্ঠ; রাষ্ট্র; সৃষ্টি।

[গ] ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পরস্থিত ধাতুর দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন, বিষণ্ন; নিষেধ; সুষমা; অভিষেক; নিষিদ্ধ; সুষুপ্ত; নিষিক্ত।

[ঘ] কিছু শব্দে সব সময় মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন, কলুষ; দোষ; বিষয়; আষাঢ়; কৃষক; পাষাণ।

[ঙ] ঋ, র, রেফ-এর মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন, কৃষক; ঋষি; বর্ষ।

[চ] সন্ধিতে ই-পরস্ত বিসর্গের পর ক, প, ফ থাকলে বিসর্গস্থলে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন, নিষ্কর; নিষ্পাপ; নিষ্ফল।

১.৭.২ মূর্ধন্য ষ-এর তুলনায় দন্ত্য স-এর ব্যবহার অধিক। ষত্ববিধিতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মূর্ধন্য ষ ব্যবহার নিষেধ করে দন্ত্য স ব্যবহার করতে বলা হয়েছে :

[ক] 'সাৎ' প্রত্যয় সাধিত শব্দের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হবে না। অর্থাৎ এ জাতীয় শব্দে স হবে। যেমন, ভূমিসাৎ; অগ্নিসাৎ; ধূলিসাৎ; আত্মসাৎ।

[খ] পূর্বপদে ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গ যুক্ত হলেও কিছু শব্দে দন্ত্য স হবে। যেমন,

ই-কারান্ত উপসর্গ : পরিসীমা; পরিস্থিতি; বিসংবাদ; বিসর্গ।

উ-কারান্ত উপসর্গ : অনুসরণ; অনুস্বার; সুসময়।

[গ] ত-বর্গীয় ('ত', 'থ') সংযুক্ত বর্ণের শিস্ ধ্বনি দন্ত্য স হবে। যেমন, প্রস্তর; স্থান; স্তব; স্থবির; স্তাবক; স্থির; অস্ত; স্বস্তি; বস্ত্র; সমস্ত; বিস্তার; নিস্তার; দুস্তর; প্রস্তাব; গ্রস্ত; মস্ত; আস্তিক; স্থায়ী; স্থপতি; স্ত্রী; স্তর; স্থগিত ইত্যাদি।

১.৭.৩ 'স্পৃহ' ও 'স্পন্দ্' ধাতুযোগে গঠিত শব্দে সব সময় দন্ত্য স হবে। যেমন, নিস্পৃহ; নিস্পন্দ।

১.৭.৪ 'স্ফুট্' ও 'স্ফুর' ধাতুর সাহায্যে গঠিত শব্দের দন্ত্য স কখনোই মূর্ধন্য ষ হয় না। এ সব শব্দে কেবল স-ই মান্য। যেমন, দন্তস্ফুট; পরিস্ফুট; স্ফুরণ; বিস্ফোরক।

বিসর্গের [ঃ] ব্যবহার

১.১০.০ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানানের নিয়ম পুস্তিকার চূড়ান্ত (তৃতীয়) সংস্করণে তৎসম শব্দে বিসর্গ ব্যবহার প্রসঙ্গে নীরবতা পালন করা হয়েছে। কিন্তু মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৯৯৩:৬২) জানিয়েছেন যে, এই পুস্তিকার প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে সে-বিধান ছিল :

> *বিসর্গান্ত সংস্কৃত পদের শেষের বিসর্গ বর্জিত হইবে; যথা— আয়ু, মন, ইতস্তত, ক্রমশ, বিশেষত ইত্যাদি।*

তৃতীয় সংস্করণে এ বিধান পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ সমকালীন প্রতিক্রিয়া। এ সম্পর্কে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (প্রাগুক্ত) স্বয়ং বলেছেন :

> *সমিতি দুই সংস্করণ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তৃতীয় সংস্করণে পিছিয়ে গেলেন কেন বুঝতে পারি না। বিসর্গ-বর্জনে কি পণ্ডিত মহাশয়দের আপত্তি ছিল? হতে পারে, তাঁদের মৃদু আপত্তি প্রথম দুই সংস্করণ পর্যন্ত সংস্কারকদের টলাতে পারে নি; কিন্তু তৃতীয় সংস্করণ কালে পণ্ডিত মহাশয়েরা বোধ হয় আবার আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে থাকবেন। তাই সংস্কারটা আর হয়ে উঠল না— লেখকদের মর্জির উপরই ছেড়ে দেওয়া হল।*

অধ্যাপক জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ (নেপাল মজুমদার সম্পা.; ১৯৯২:৩৬)-এর অভিমতও অভিন্ন। তিনি তৎসম শব্দে বিসর্গ বর্জনের বিরোধী :

> *বিসর্গান্ত পদগুলি সম্বন্ধে কি নিয়ম করিবেন? যদি বিসর্গ রাখেন, তাহা হইলে মুখ্যত, সতত, সাধারণতঃ, স্বর্গতঃ প্রবৃতি শব্দের কোন্‌টি বিসর্গান্ত এবং কোন্‌টি নহে তাহা জানিতে হইলে সংস্কৃত জানিতে হইবে। যদি বিসর্গ না রাখেন, তাহা হইলে, পুনপুন, ইততত লিখিতে হইবে। উভয় দিকেই বিপদ।*

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-ও তৎসম শব্দে বিসর্গ ব্যবহারের সপক্ষতা করেছেন। তাঁর (নেপাল মজুমদার সম্পা.; প্রাগুক্ত: ১০৪) বিবেচনা :

> *আমরা কেবল তদ্ভব-মন শব্দে উচ্চারণ-হেতু বিসর্গ লোপ সমর্থন করি। অন্যত্র বিসর্গের স্পষ্ট উচ্চারণ না হইলেও ব্যুৎপত্তি ও সন্ধির জন্য বিসর্গ রক্ষা করাই প্রয়োজন মনে করি। ক্রমশ, লোমশ এই দুই স্থানে দুই পদ্ধতি প্রত্যয় এবং দুই পৃথক উচ্চারণ আছে। কাজেই ক্রমশঃ লোমশ এইরূপ লেখা আবশ্যক।*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশিত (তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৬) হওয়ার তিন বছর পর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা*

ব্যাকরণ প্রকাশিত (১৯৩৯) হয়। এ গ্রন্থে তিনি (১৯৮৮:৫১) বিসর্গ বর্ণ ও বাংলায় এর অবস্থান দৃঢ়তার সঙ্গেই উপস্থাপন করেছেন :

> ইহা এক প্রকার "হ"-এর ধ্বনি। সাধারণ 'হ' হইতেছে ঘোষ ধ্বনি, "ঃ" তাহার অনুরূপ অঘোষ ধ্বনি। এই ধ্বনি সংস্কৃত শব্দে প্রায়ই মিলে, আর বাঙ্গালা ভাষায় একমাত্র বিস্ময়াদি-প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায়; যথা— "আঃ, উঃ, ওঃ" ইত্যাদি।

এছাড়াও অনুস্বারের সঙ্গে বিসর্গের তুলনা করে তিনি দুটি বর্ণকেই 'অযোগবাহ' বর্ণ বলেছেন। তাঁর মতে, "ইহারা যেন স্বর-ও ব্যঞ্জন মালার বাহিরে অবস্থান করে।"

১.১০.১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমোদিত না-হলেও পদান্তের বিসর্গ-বর্জন এখন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। *সাহিত্য সংসদ* (রমেন ভট্টাচার্য; ১৯৯৩:৪৪) এবং *আনন্দ বাজার* গোষ্ঠী পর্যন্ত তা অনুসরণ করছেন। তৎসম শব্দের অন্ত বিসর্গ পরিহার আমরা স্বীকার করি। আমরা 'চক্ষু'; 'ছন্দ'; 'জ্যোতি'; 'তপ'; 'ধনু'; 'পন্থা'; 'মন'; 'যজু'; 'শির'; 'শ্রেয়'; 'সদ্য'; 'স্রোত'; 'চন্দ্রমা' ব্যবহার করতে চাই। প্রশ্ন উঠতে পারে 'চশস্'; ও 'তস্'; প্রত্যয়ে সাধিত শব্দ সম্পর্কে। এ জাতীয় শব্দের অন্তঃস্থ বিসর্গ রক্ষা করতে চেয়েছেন অনেকে (রমেন ভট্টাচার্য; প্রাগুক্ত: ৪৪); আবার বিপরীত ধারণাও বর্তমান (আনিসুজ্জামান সম্পা.; ১৯৯২:৪৮)। সুতরাং আমরা নির্দ্বিধায় লিখতে পারি: অন্তত; আপাতত; ইতস্তত; ক্রমশ; পুনঃপুন; প্রায়শ; ফলত; বস্তুত; বিশেষত; মুহুর্মুহু; স্বভাবত।

'প্রথমতঃ', 'দ্বিতীয়তঃ', 'তৃতীয়তঃ', 'চতুর্থতঃ' লিখতে অনেকে শেষে বিসর্গ ব্যবহার করে থাকেন। 'তস্' প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দে বিসর্গ বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আর মতপার্থক্যের অবকাশ নেই। স্বাচ্ছন্দ্যেই লেখা যেতে পারে: প্রথমত; দ্বিতীয়ত; তৃতীয়ত; চতুর্থত; পঞ্চমত ইত্যাদি।

১.১০.২ সমাসবদ্ধ শব্দে পদমধ্যস্থ বিসর্গ রক্ষায় সবাই এক মত। সে-অনুসারে হবে: অতঃপর; অধঃপাত; উচ্চঃস্বর; ধনুঃশর; পয়ঃপ্রণালী; বয়ঃক্রম; বয়ঃপ্রাপ্ত; বয়ঃসন্ধি; মনঃকষ্ট; মনঃক্ষুণ্ণ; মনঃক্ষোভ; মনঃপীড়া; মনঃপূত; মনঃপ্রাণ; মনঃসংযোগ; মনঃসমীক্ষা; শিরঃপীড়া; সদ্যঃপক্ব; সদ্যঃপাতী; সদ্যঃস্নাত। এ নিয়মে আমরা ছন্দঃবদ্ধ; ততঃধিক; পুনঃমুদ্রণ; বয়ঃজ্যেষ্ঠ; মনঃনিবেশ;

মনঃবেদনা; মনঃভাব; মনঃযোগ; সদ্যঃমুক্ত; সদ্যঃমৃত লেখার প্রস্তাব করছি। বর্ণাশুদ্ধি পরিহার ছাড়াও তাতে তৎসম শব্দের বানানে সহজতা আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

১.১০.৩ সন্ধির নিয়মে 'স্ত, স্থ, স্প পরে থাকলে বিকল্পে বিসর্গ লোপ হয়' (রমেন ভট্টাচার্য; প্রাগুক্ত)। যেমন, নিস্তব্ধ; অন্তস্থ; নিশ্বাস; নিস্পৃহ; দুস্থ; নিস্পন্দ; বয়স্থ ইত্যাদি। তৎসম শব্দের মধ্যঃস্থ বিসর্গ পরিহার করা যখন সম্ভব হচ্ছে না, তখন একই শব্দের বানানের দ্বৈত রূপকে আহ্বান না করাই বাঞ্ছনীয়। এ-ক্ষেত্রে আমরা লিখতে চাই: নিঃস্তব্ধ; অন্তঃস্থ; দুঃস্থ; নিঃশ্বাস; নিঃস্পৃহ; বয়ঃস্থ; মনঃস্থ।

উপসংহার

তৎসম শব্দের বানান অভিদান-সুনির্দিষ্ট হলেও এ জাতীয় শব্দ পুনর্বিন ও পুনর্বিবেচনায় অভিধান অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অবকাশতা আছে :

[ক] ইন্-ভাগান্ত শব্দে কেবল ই-কার ব্যবহার করলে এ ধরনের শব্দে সমতা ও প্রতিসাম্য বিধান করা যাবে।

[খ] সন্ধিবদ্ধ শব্দে ম্-স্থানে শুধু অনুস্বার গ্রহণ করলে বিকল্প বানান ব্যবহারে সুযোগ থাকবে না।

[গ] যে সব শব্দে ই বা ই-কার কিংবা ঈ বা ঈ-কার দুইই শুদ্ধ সে-সব ক্ষেত্রে প্রথম-উক্ত বানান গ্রহণ করা যেতে পারে।

[ঘ] গঠনগত দিক থেকে 'অ' ও 'য' দুটি প্রত্যয় যেখানে সিদ্ধ সেখানে 'অ'-ই গ্রহণীয়।

সহায়ক গ্রন্থ

অশোক মুখোপাধ্যায়: ১৯৮৯. *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*. সাহিত্য সংসদ: কলকাতা

আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত): ১৯৯২. *পাঠ্য বইয়ের বানান*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড: ঢাকা

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ: ১৯৮৬. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (দ্বিতীয় খণ্ড). সাহিত্য সংসদ: কলকাতা

নেপাল মজুমদার (সংকলিত ও সম্পাদিত); ১৯৯২ *বানান বিতর্ক*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি: কলকাতা

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য; ১৯৮৯, *ভাষাবিদ্যা পরিচয়*, জয়দুর্গা লাইব্রেরী: কলিকাতা

বাংলা/কী লিখবেন/কেন লিখবেন, ১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড: কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু (অনূদিত); ১৯৮০, ভূমিকা: *কালিদাসের মেঘদূত*, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ: কলকাতা

মধুসূদন রচনাবলী (ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত); ১৯৯৩, সাহিত্য সংসদ: কলিকাতা

রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৯৩, বিশ্বভারতী : কলিকাতা

রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, ১৩৯৫: বিশ্বভারতী : কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ১৩৯৫, *বাংলাভাষা পরিচয়*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ: কলিকাতা

শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী (আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সম্পাদিত), তৃতীয় খণ্ড: ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী: ঢাকা

সুকুমার সেন; ১৯৯৩, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড: কলকাতা

সুকুমার সেন, পণ্ডিত হরনাথ ঘোষ; ১৩৫৩, *বাঙ্লা ভাষার ব্যাকরণ*, ভিক্টোরিয়া বুক ডিপো: কলিকাতা

সুভাষ ভট্টাচার্য; ১৯৮৬, *আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান*, ডি.এম. লাইব্রেরী: কলকাতা

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; ১৯৬৬, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমী: নিউ দিল্লী